সংবাদ

তারিখ ... 19 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম ... 6

ফিচার

উপবৃত্তির টাকা

পিয়া, মর্জিনা, তানিয়া, জনি, নাসরিন ও সুমীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কল্পনা ওদের বাপ-মায়ের। কাউকে বানাবেন শিক্ষক, কাউকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, উকিল-মোক্তার। আবার কেউবা রাজনীতি করে হবেন দেশের হর্তাকর্তা-মন্ত্রী-মিনিস্টার। এসব পেশায় থেকে তারা দেশ ও জনগণের খেদমত করবে। তাতে যেমন এদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, তেমনই অঢেল অর্থ আসবে ঘরে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাবে জীবন।

বছর কয়েক আগেও এসব শিশুকে নিয়ে নানা দুশ্চিন্তায় থাকতেন অভিভাবকরা। এসব শিশু সকাল-সন্ধ্যা কাটাত কেবল হৈ-হুল্লা আর ঘোরাফেরা করে। এখন ওরা দারুণ ব্যস্ত লেখাপড়া নিয়ে। ৮/৯ বছর আগেও এদের অভিভাবক এদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে পারেনি। যে বয়সে এদের ব্যস্ত থাকার কথা ছিল বইপত্র নিয়ে সে বয়সেই এদের নামতো হতো পয়সা কামাতে। যুগের চাহিদায় সুসময় এসে যায়। পাল্টে যায় অনেক কিছু। এমন একটি উদ্যোগ এদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। পাল্টে দিয়েছে জীবনধারা।

সরকার ঘোষিত উপবৃত্তি মফস্বল এলাকার প্রাথমিক শিক্ষাচিত্র প্রায় পুরোটা বদলে দিয়েছে। উপবৃত্তির সুবাদে গ্রামের অনেক স্কুল এখন শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত। বেড়ে গেছে ছাত্র ভর্তি, ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্নের হার। ফলে ঝরে পড়ার প্রবণতা কমেছে অনেক।

উপবৃত্তি চালুর আগে ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়লেও সরকারি হিসাবে এ হার বর্তমানে ৩৩। আর স্কুলে ভর্তির হার ৯৭। বেসরকারি হিসাবে ভিন্নতা থাকলেও উপবৃত্তি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি প্রবল' আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব উল-আলম বলেন, উপবৃত্তির মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক স্তরে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। ১৯৯৪ সালে সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি স্থগিত করে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সারাদেশে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষাচক্রের সমাপ্তি ও উপস্থিতি হার বাড়িয়ে ঝরে পড়ার হার রোধ এবং গুণগত মানোন্নয়নই ছিল এর লক্ষ্য। প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে দেশের ৬৫ হাজার ৫১টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬০ লাখ ৭২০ জন ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তি পাচ্ছে। ছয় ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬১ হাজার ৭৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩ হাজার ৩০০টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী পরিবার সংখ্যা ৫৭ লাখ ৯৭ হাজার ৮৯। এর মধ্যে ৫৫ লাখ ৯৩ হাজার ৪৫৮ একক ও ২ লাখ ৩ হাজার ৬৩১টি একাধিক সন্তানের পরিবার। এক সন্তানের জন্য উপবৃত্তি হিসেবে দরিদ্র পরিবারটিকে দেয়া হচ্ছে মাসে ১০০ টাকা করে। একাধিক সন্তানের পরিবারের ছাত্র উপবৃত্তি রয়েছে তিন মাসে ১২৫ টাকা করে। তিন মাসে মাত্র ১২৫ টাকার উপবৃত্তিই এভাবে পাল্টে দিয়েছে গ্রামীণ অনেক শিশুর জীবন।

রাজধানীর কাছেই ভেভাবর নতুনপাড়া। সাভারের শিমুলিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম। সেখানকার ৮ বছর বয়সী শিশু জেসমিন আখতার পিয়ার শৈশবও বদলে গেছে উপবৃত্তির কল্যাণে। তার ভ্যানচালক পিতা কুদ্দুস সাতজনের সংসার চালিয়ে তৃতীয় কন্যা পিয়াকে স্কুলে পাঠাতে পারছিলেন না। উপবৃত্তির জন্যই কন্যাকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। স্কুল থেকে পাওয়া টাকা দিয়েই এখন পিয়ার লেখাপড়ার খরচ মেটায়। কিছু জামা-কাপড়ও হয় তাতে। আবদুল কুদ্দুস জানান, তার আরেক কন্যা মর্জিনা বেগমকেও উপবৃত্তির জন্যই স্থানীয় জাফর আহমেদ হাইস্কুলে ভর্তি করাতে পেরেছেন। পিয়া পড়ছে ভেভাবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। একই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়া আক্তার পিতৃহীন। সংসারে তিন ভাই, এক বোন। মা হোসনে আরা বেগম গার্মেন্টসে চাকরি করেন। স্বল্প আয়ে সংসার টানাটানির মধ্যে চলে। শিশু তানিয়া জানাল, উপবৃত্তি না থাকলে তার স্কুলে যাওয়া হতো না। ভেভাবর নতুনপাড়ার নারগিস বেগমের দুই মেয়ে এক ছেলে। স্বামী আনোয়ার হোসেন দিনমজুর। কোনদিন কাজ পায়, কোনদিন পায় না। অভাবের সংসার। নারগিসের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন জনি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে ভেভাবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নারগিস বেগম অকপটেই বললেন, উপবৃত্তি না দিলে জনিকে স্কুলেই পাঠাতে পারতাম না। তাকেও কাজে দিতে হতো। ভেভাবরের কৃষক হাবিবুর রহমানের কন্যা নাসরিন আক্তার উপবৃত্তির টাকা দিয়ে জামা-কাপড় কেনার পাশাপাশি পরীক্ষার ফি দেয়। বাকি টাকা মা সংসারের কাজে খরচ করে বলে জানায় নাসরিন। ভেভাবর কবরস্থান রোডের গাড়িচালক চান খানের কন্যা অসমিয়া আক্তার সুমি একই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তার চার বোন। বড় দুই বোনের ভাগ্যে স্কুল জোটেনি। আরেকজন ছোট। উপবৃত্তির কারণেই সুমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে বলে জানান ওই স্কুলের শিক্ষিকা ইয়াসমিন নূর। বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তির জন্য বাছাইয়ের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির। আর উপবৃত্তি দেয়ার শর্তের মধ্যে রয়েছে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৮৫ শতাংশ পাঠ দিবসে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের থাকতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করতে হবে সব পরীক্ষায়। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরতদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণও এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। এছাড়া অনুকূল আবহাওয়ার দিনে বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬০ শতাংশ উপস্থিত না থাকলে ওই বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার সন্তোষজনক না হওয়া পর্যন্ত উপবৃত্তি বন্ধ রাখার শর্ত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৯৩ সালে ভর্তির হার ছিল ৯০ শতাংশ। উপবৃত্তি প্রবর্তনের পরের বছরই এ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯১ শতাংশে। বর্তমানে সরকারি হিসাবে এ হার ৯৭ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। ২০০২ সালেই তা ৫০:৫০ উন্নীত হয়। পরের দু'বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪৯:৫১। উপবৃত্তির ফলে ড্রপ আউটও কমেছে। ১৯৯১ সালেও দেশে স্কুলে এ হার ছিল ৫৯.৩ শতাংশ। অর্থাৎ মাত্র ৪০.৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের পাঁচ বছর মেয়াদি শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করতে পারত। উপবৃত্তি চালুর পাঁচ বছরের মাথায় ১৯৯৯ সালে ঝরে পড়ার হার নেমে আসে ৩৫-এ। ব্যানবেইসের সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০০-২০০১ সালে ঝরে পড়ার হার নেমে এসেছে শতকরা ৩৩-এ। শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার হার বৃদ্ধি পায় ৬৭-তে। গত বছরও একই হার ছিল বলে উপবৃত্তি প্রকল্পের পরিচালক জানিয়েছেন। এভাবেই উপবৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলেও অর্থের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বাড়ালে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং এসব শিশুই তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়ে দেশের উন্নয়ন ও জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে।

উপবৃত্তির টাকা এই বঞ্চিত শিশুদের স্কুলমুখো করতে পারেনি

☐ সারোয়ার হোসেন
পিআইবি-ইউনিসেফ ফিচার